بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৪ জানুয়ারি, ২০২০ মোতাবেক ২৪ সুলাহ্, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হল, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)। তার পিতার নাম ছিল রওয়াহা বিন সা'লাবাহ্ এবং তার মায়ের নাম ছিল কাবশাহ্ বিনতে ওয়াক্বেদ বিন আমর, যিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু হারেস বিন খাযরাজ বংশের সদস্যা ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) আকাবার বয়আতেও যোগদান করেছিলেন আর (তিনি) বনু হারেস বিন খাযরাজের নেতা ছিলেন। তার ডাক নাম ছিল আবু মুহাম্মদ। কেউ কেউ আবু রওয়াহা এবং আবু আমরও উল্লেখ করেছে। **{উসদুল গাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩৫, আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.). বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৮ সালে প্রকাশিত}**

জনৈক আনসারের বর্ণনামতে মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) ও হযরত মিক্বদাদ (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। ইবনে সা'দ-এর মতে তিনি মহানবী (সা.)-এর একজন কাতেব বা ওহী-লেখকও ছিলেন। **{আল্ ইসাবাহ্ ফী তামীযিস্ সাহাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭৩, আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.). বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৫ সালে প্রকাশিত}**

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) বদর, উহুদ, খন্দক, হুদায়বিয়া, খায়বার ও উমরাতুল কাযাসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মূতার যুদ্ধে শহীদ হন। মূতার যুদ্ধের নেতাদের মধ্যে তিনিও একজন নেতা ছিলেন।

একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন যখন তিনি (সা.) খুতবা দিচ্ছিলেন। খুতবা চলাকালে তিনি (সা.) বলেন, বসে পড়– একথা শোনামাত্রই তিনি (রা.) মসজিদের বাইরে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানেই বসে পড়েন। মহানবী (সা.) যখন খুতবা শেষ করেন এবং এই সংবাদ পান তখন তিনি তাকে বলেন,

زَادَكَ اللهُ حِرصًا عَلٰى طَوَاعِيَةِ اللهِ وَ طَوَاعِيَةِ رَسُوْلِهٖ অর্থাৎ, **'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের স্পৃহা আল্লাহ্ তোমার মাঝে আরও বৃদ্ধি করুন।'** (আনুগত্যের) অনুরূপ ঘটনা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) সম্পর্কে (ও) হাদীসগ্রন্থে পাওয়া যায় এবং তার বরাতে সেই ঘটনা আমি এক খুতবায় বর্ণনা করেছি। আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) সম্পর্কেও এই বর্ণনা রয়েছে, তিনিও বাইরে বসে ছিলেন, কথা শোনামাত্রই দরজায় বসে পড়েন এবং এভাবে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে এসেছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) জিহাদের উদ্দেশ্যে সবার আগে বাড়ি থেকে রওয়ানা হতেন এবং সবার শেষে ফিরে আসতেন। হযরত আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি সেদিন হতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি যেদিন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহার স্মৃতিচারণ করব না। তিনি যখন সম্মুখ থেকে এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন আমার বক্ষে হাত রাখতেন, অর্থাৎ বিষয়টি এমন ছিল যার উল্লেখ করা আবশ্যক। তিনি (রা.) বলেন, যখনই তিনি আমার সাথে দেখা করার মানসে সম্মুখ থেকে আসতেন বা আমার সাথে সাক্ষাৎ হত তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) আমার বক্ষে হাত রাখতেন। হযরত

আবু দারদা (রা.) বলেন, আর ফিরে যাবার সময় তার সাথে আমার দেখা হলে তিনি আমার দু'কাঁধের মাঝখানে হাত রাখতেন এবং আমাকে বলতেন, يَا عُوَيْمِرُ، اِجْلِسْ فَلْنُؤْمِنْ سَاعَةً অর্থাৎ, **'হে উয়ায়মের! বস, কিছুক্ষণ আমরা ঈমানকে সতেজ করি!'** এরপর যতক্ষণ আল্লাহ্ চাইতেন আমরা বসে আল্লাহ্ তা'লার যিকর বা স্মরণ করতাম। পুনরায় হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) বলতেন, **'হে উয়ায়মের! এগুলো হল ঈমানের আসর বা বৈঠক।'** {উসদুল গাবাহ্, ফী মা'রিফাতিস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৫-২৩৬, আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.). বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৮ সালে প্রকাশিত}, {আল্ ইসতিয়াব, ফী মা'রিফাতিল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪, আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.). বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১০ সালে প্রকাশিত}, (সুনান আবী দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাব আল্ ইমামু ইউকাল্লিমুর রাজুলা ফী খুতবাতিহী, হাদীস নংঃ ১০৯১)

হযরত ইমাম আহমদ এর গ্রন্থ কিতাবুয্ যুহদ-এ বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) যখন কোন সঙ্গীর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন বলতেন, এসো কিছুক্ষণের জন্য আমাদের প্রভুর প্রতি ঈমান আনার স্মৃতিকে সতেজ করি বা ঝালিয়ে নেই। এই (গ্রন্থেই) রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'আল্লাহ্ তা'লা ইবনে রওয়াহা (রা.)'র প্রতি কৃপা করুন; সে এমন সব বৈঠককে ভালোবাসে যা নিয়ে ফিরিশতারাও গর্ব করে।'**

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ। অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) কতই না উত্তম ব্যক্তি। খায়বারের বিজয়ের পর মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-কে ফল এবং ফসল ইত্যাদির পরিমাণ নিরূপণের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। একবার হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েন যে, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। মহানবী (সা.) তার শুশ্রূষার জন্য যান। তিনি (সা.) বলেন, **'হে আল্লাহ্! যদি তার নির্ধারিত সময় এসে গিয়ে থাকে তাহলে তার জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি কর।** অর্থাৎ এটি যদি তার মৃত্যুর সময় হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য তা সহজ করে দাও। **আর যদি তার নির্ধারিত সময় না এসে থাকে তাহলে তাকে আরোগ্য দান কর।'** এই দোয়ার পর হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)'র জ্বর কিছুটা কমে যায়, তিনি কিছুটা সুস্থ অনুভব করলে বলেন, **হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার অসুস্থতার সময় আমার মা বলছিলেন, হায় আমার পাহাড়, হায় আমার আশ্রয়। তখন আমি দেখি, একজন ফিরিশ্তা লৌহগদা হাতে দাঁড়িয়ে বলছিল, তুমি কি আসলেই এমন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন সে আমাকে সেই গদা দিয়ে আঘাত করে।'**

এ সম্পর্কিত আরেকটি বর্ণনায় এটিও রয়েছে, আর এটিই অধিক সঠিক মনে হয়, তিনি (রা.) বলেন, **ফিরিশ্তা একটি লৌহগদা উঠিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, তুমি কি তেমনই যেমনটি তোমার মা বলছে, অর্থাৎ তুমি পাহাড় এবং আমার আশ্রয়? এটি তো শিরক করার মতো কথা হয়ে যায়। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) বলেন, আমি যদি বলতাম হ্যাঁ, আমি এমনই, তাহলে সে অবশ্যই আমাকে গদা দিয়ে আঘাত করত।** {আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১৭, আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.), দারুল ফিকর থেকে ২০১২ সালে প্রকাশিত}

তিনি (রা.) কবিও ছিলেন আর সেই কবিদের একজন ছিলেন যারা মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে বিরোধীদের অপলাপের উত্তর প্রদান করতেন। সেগুলোর মধ্য হতে কয়েকটি পঙক্তি হল,

إِنِّي تَفَرَّسْتُ فِيكَ الْخَيْرَ أَعْرِفُهُ

وَاللهِ يَعْلَمُ أَنَّ مَا خَانَنِيْ الْبَصَرُ
أَنْتَ النَّبِيُّ وَمَنْ يُحْرَمْ شَفَاعَتَهُ
يَوْمَ الْحِسَابِ فَقَدْ أَزْرَى بِهِ الْقَدَرُ
فَثَبَّتَ اللهُ مَا آتَاكَ مِنْ حَسَنٍ
تَثْبِيْتَ مُوْسٰى وَنَصْرًا كَالَّذِيْ نُصِرُوْا

অর্থাৎ আমি আপনার পবিত্র সত্তায় অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর সত্তায় কল্যাণ খুঁজে পেয়েছিলাম, আর আল্লাহ্ জানেন, আমার দৃষ্টি প্রতারিত হয় নি। আপনি নবী (সা.)। কিয়ামত দিবসে যে ব্যক্তিকে আপনার সুপারিশ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে নিঃসন্দেহে ভাগ্য বা নিয়তি তাকে মূল্যহীন করে দিয়েছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে (সা.) প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যে আপনাকে অবিচলতা দান করুন যেভাবে তিনি মূসা (আ.)-কে অবিচল রেখেছিলেন আর তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) আপনাকে সাহায্য করুন যেভাবে তিনি সেসব নবীকে সাহায্য করেছেন।

মহানবী (সা.) এই পঙ্‌ক্তিগুলো শুনে বলেন, হে ইবনে রওয়াহা! আল্লাহ্ তোমাকে অবিচল রাখুন। হিশ্‌শাম বিন উরওয়াহ্ বলেন, এই দোয়ার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা তাকে পূর্ণরূপে অবিচল রাখেন, এমনকি তিনি (রা.) যখন শহীদ হন, তার জন্য জান্নাতের দ্বারগুলো উন্মুক্ত দেয়া হয় আর (তিনি) তাতে শহীদ হয়ে প্রবেশ করেন।

ইবনে সা'দ (রা.)'র বর্ণনা হল, এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়–وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (সূরা আশ্ শো'আরা: ২২৫) অর্থাৎ আর কবিদের বিষয় হল, কেবল বিভ্রান্তরা-ই তাদের অনুসরণ করে। তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন, আমি (কি তাহলে) তাদের অন্তর্ভুক্ত? তখন আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (সূরা আশ্ শো'আরা: ২২৮) অর্থাৎ তারা ব্যতিরেকে যারা তাদের মধ্য থেকে ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে। মু'জিমুশ্ শো'আরা'র প্রণেতা লিখেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) অজ্ঞতার যুগেও অনেক সম্মানিত ছিলেন এবং ইসলামেও তিনি অনেক উন্নত মান ও মর্যাদা লাভ করেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্বগাঁথায় এমন একটি পঙ্‌ক্তি বলেছেন যেটিকে তার শ্রেষ্ঠ পঙ্‌ক্তি বলা যেতে পারে। এই পঙ্‌ক্তিটি তার হৃদয়ের চিত্র স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। যাতে হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন,

لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيْهِ اٰيَاتٌ مُبَيِّنَةٌ
كَانَتْ بَدِيْهَتُهُ تُنْبِيْكَ بِالْخَبَرِ

অর্থাৎ যদি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সত্তা সম্পর্কে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী না-ও থাকত তাহলে তাঁর (সা.) সত্তা-ই প্রকৃত বাস্তবতা অবগত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

{আল্ ইসাবাহ্ ফী তামীযিস্ সাহাবাহ্ লি-ইবনে হাজর আসকালানী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭৩-৭৫, আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.). বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৫ সালে প্রকাশিত}, {উসদুল গাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩৬, আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.). বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৮ সালে প্রকাশিত}, {আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০১, আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) অজ্ঞতার যুগেও লেখাপড়া জানতেন। অথচ, সে যুগে আরবে লেখাপড়ার প্রচলন খুবই কম ছিল। বদরের যুদ্ধ শেষে মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ বিন হারেসাহ্ (রা.)-কে **মদীনা** অভিমুখে এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-কে **আওয়ালী** অভিমুখে বিজয়ের সুসংবাদ দেয়ার জন্য বদর প্রান্তর থেকে প্রেরণ করেন। মদীনার ওপরের দিকে চার মাইল থেকে আট মাইলের মধ্যে অবস্থিত বা বিস্তৃত অঞ্চলকে **আওয়ালী** বলে। এ অঞ্চলে কুবার জনবসতি এবং আরো কতিপয় গোত্র বসবাস করে। হযরত সাঈদ বিন জুবায়ের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) উটে চড়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন। তিনি তার ছড়ি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন বা স্পর্শ করছিলেন। তাঁর সাথে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)ও ছিলেন। তিনি তাঁর (সা.) উটের লাগাম ধরে হাঁটছিলেন আর এই পঙ্‌ক্তি পাঠ করছিলেন:

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَن سَبِيلِهِ
نَحْنُ ضَرَبْنَاكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِ
ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ

অর্থাৎ হে কাফিরের দল! তাঁর (সা.) পথ থেকে সরে যাও, (নতুবা) আমরা তাঁর (সা.) নির্দেশে তোমাদের ওপর এমন আঘাত করব যে, গ্রীবা থেকে তোমাদের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলব।

হযরত কায়েস বিন আবু হাযেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-কে বলেন, নীচে নেমে আমাদের উটগুলোর গতিসঞ্চার কর, অর্থাৎ কিছু পঙক্তি পাঠ করে উটগুলোর মাঝে গতি সঞ্চার কর যেমনটি ইহুদীরা করে থাকে। তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি তো এসব বাক্য বলা ছেড়ে দিয়েছি। হযরত উমর (রা.) বলেন, শোন এবং আনুগত্য কর। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) এই পঙক্তি পড়তে পড়তে নিজের উট থেকে নামেন–

يَا رَبِّ لَوْ لَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا
وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا
وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا
إِنَّ الْكُفَّارَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু! তুমি না হলে আমরা হিদায়েত পেতাম না। আমরা দান-খয়রাতও করতাম না আর নামাযও পড়তাম না। আমাদের প্রতি সুখ ও প্রশান্তি অবতীর্ণ কর এবং আমরা যখন শত্রুর মোকাবিলা করব তখন আমাদের পদদ্বয়কে সুদৃঢ় রেখ। কেননা, কাফিররা আমাদের ওপর আক্রমন করছে। ওকী' বলেন, অন্য বর্ণনাকারী এর সাথে যোগ করেছে;

وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

অর্থাৎ তারা ফিতনা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চাইলে আমরা তা অস্বীকার করি। অর্থাৎ আমরা এই ফিতনা ও নৈরাজ্যকে প্রতিহত করি এবং এটিকে ছড়াতে দেই না। বর্ণনাকারী

বলেন, মহানবী (সা.) বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি এদের প্রতি কৃপা কর। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, অবধারিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর দোয়ার কল্যাণে এই রহমত বা কৃপা অবধারিত হয়ে গেছে।

হযরত উবাদাহ্ বিন সামেত (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)'র শুশ্রূষার জন্য গেলে তিনি (রা.) তাঁর (সা.) সম্মানে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছিলেন না। তিনি (সা.) বলেন, তোমাদের কি জানা আছে, আমার উম্মতের **শহীদ কারা?** লোকজন বলে, **মুসলমানের নিহত হওয়াই শাহাদত**। তিনি (সা.) বলেন, **তাহলে তো আমার উম্মতের শহীদের সংখ্যা অনেক কমিয়ে দেয়া হল**। মহানবী (সা.) বলেন, **মুসলমানের নিহত হওয়া, পেটের পীড়ায় মৃত্যু বরণ করা, পানিতে ডুবে মারা যাওয়াও শাহাদত, আর সন্তান প্রসবকালে যে মহিলা মারা যায় সে-ও শহীদ**–এগুলো সবই শাহাদাতের প্রকারভেদ। {আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৮-৪০০, আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, (মু'জিমুল বুলদান, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৮৭), (আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩, বাব গযওয়াহ্ বদর, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)

হযরত উরওয়াহ্ বিন যুবায়ের (রা.)'র বর্ণনা হল, মহানবী (সা.) মূ'তার যুদ্ধাভিযানে হযরত যায়েদ বিন হারেসাহ্ (রা.)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করেন আর বলেন, যদি তিনি শাহাদত বরণ করেন তাহলে হযরত জা'ফর বিন আবু তালিব (রা.) তার স্থলাভিষিক্ত হবেন। এরপর হযরত জা'ফর (রা.)ও যদি শহীদ হয়ে যান তাহলে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। আর যদি হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)ও শহীদ হয়ে যান তাহলে মুসলমানরা যাকে পছন্দ করবে তাকে নিজেদের সেনাপতি মনোনীত করে নিবে। অতএব সেনাদল যখন প্রস্তুতি সুসম্পন্ন করে এবং যাত্রা আরম্ভ করে তখন লোকজন মহানবী (সা.) মনোনীত নেতাদের বিদায় জানায় এবং তাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করে দোয়া করেন। যখন লোকজন মহানবী (সা.)-এর নেতাদের এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-কে বিদায় জানায় তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) কাঁদতে আরম্ভ করেন। লোকেরা কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি (রা.) উত্তরে বলেন, খোদার কসম! জগতের ভালোবাসা এবং এর প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমার নেই বরং আমি মহানবী (সা.)-কে এই আয়াত পড়তে শুনেছি, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَاكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا (সূরা মরীয়মঃ ৭২) অর্থাৎ, আর তোমাদের মাঝে এমন একজনও নেই, কিন্তু সে অবশ্যই তাতে প্রবেশ করবে অর্থাৎ জাহান্নামে, এটি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে এক অনিবার্য সিদ্ধান্ত। অতএব আমি জানি না, পুল সিরাত-এ চড়া এবং পার হওয়ার সময় আমার অবস্থা কী হবে। এর পূর্বের আয়াতে জাহান্নামের উল্লেখ রয়েছে তাই তিনি ভয় পেয়েছিলেন, নতুবা অন্যান্য আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, এখানে মু'মিন এবং আল্লাহ্ তা'লার পথে জিহাদকারীদের কথা বলা হয় নি। যাহোক, মুসলমানরা বলে, আল্লাহ্ তোমার সাথে আছেন, তিনিই তোমাকে আমাদের মাঝে নিরাপদে ও সুস্থাবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন।

তফসীরে সগীরের টীকাতে লেখা আছে আর তফসীরে কবীরে দু'ভাবেই আছে যে, প্রথমত এটি মু'মিনদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, এটি কাফিরদের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অন্যান্য হাদীসের আলোকে এ বিষয়টি ব্যাখ্যাও করেছেন, যার সারমর্ম এবং তফসীরে সগীরের টীকায়ও লিখা আছে, "পবিত্র কুরআন থেকে জানা যায়, জাহান্নাম দু'ধরনের, একটি ইহকালের আর অপরটি পরকালের। এখানে যে বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে, এর অর্থ এটি নয় যে, মু'মিনরাও জাহান্নামে যাবে, বরং এর অর্থ হল,

মু'মিনরা জাহান্নামের অংশ এ জগতেই ভোগ করে নেয়। অর্থাৎ কাফিররা তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের দুঃখ-কষ্ট দেয়। অন্যথায় কুরআনের ভাষ্যমতে মু'মিনরা পরকালে কোন অবস্থাতেই জাহান্নামে যাবে না, কেননা পবিত্র কুরআন মু'মিনদের বিষয়ে বলেছে, لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا (সূরা আল্ আম্বিয়াঃ ১০৩) অর্থাৎ **মু'মিনরা জাহান্নাম থেকে এত দূরে থাকবে যে, তারা জাহান্নামের আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পাবে না**। অতএব মু'মিনদের জাহান্নামে যাওয়ার অর্থ হল, ইহজগতে তাদের কষ্ট ভোগ করা। মহানবী (সা.) জ্বরকেও এক ধরনের জাহান্নাম আখ্যা দিয়েছেন। তিনি (সা.) বলেছেন, الْحُمّٰى حَظُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنَ النَّارِ। অর্থাৎ জ্বর হল, প্রত্যেক মু'মিনের জন্য জাহান্নামের অংশবিশেষ।" **(তফসীরে সগীর, সূরা মরীয়ম এর ৭২ নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যা)**

যাহোক, এটি ছিল এর সামান্য ব্যাখ্যা। মু'মিনরা যখন তাদেরকে বিদায় জানায় তখন তারা দোয়া করেন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) তখন এই পঙ্‌ক্তিগুলো পাঠ করেন-

لَكِنَّنِيْ اَسْأَلُ الرَّحْمَانَ مَغْفِرَةً
وَ ضَرْبَةً ذَاتَ فَرْغٍ يَقْذِفُ الزَّبَدَا
اَوْ طَعْنَةً بِيَدَيْ حَرَّانَ مُجْهِزَةً
بِحَرْبَةٍ تُنْفِذُ الْأَحْشَاءَ وَالْكَبِدَا
حَتّٰى يَقُوْلُوْا اِذَا مَرُّوْا عَلٰى جَدَثِيْ
يَا اَرْشَدَ اللّٰهُ مِنْ غَازٍ وَ قَدْ رَشَدَا

অর্থাৎ কিন্তু আমি রহমান খোদার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তরবারি দিয়ে এমন আঘাত করার শক্তি যাচনা করি যা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করবে এবং তাজা রক্ত প্রবাহিত করবে যাতে ফেনা উঠবে। আর বর্শার এমন আক্রমণের (শক্তি যাচনা করি) যা পূর্ণ প্রস্তুতিসহ চরম রক্তপিপাসুর হাতে করা হয়েছে, যা নাড়িভুঁড়ি ও কলিজা বিদীর্ণ করে দিবে। এমনকি আমার সমাধির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মানুষ বলবে, হে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী! আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন আর সেই খোদা তার মঙ্গল করবেন।

এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হলে তিনি (সা.) তাকে বিদায় জানান আর সেনাবাহিনী যাত্রা করে। এক পর্যায়ে তারা মা'আন নামক স্থানে এসে শিবির স্থাপন করেন। মা'আন সিরিয়ায় হিজাযের নিকটে বালক্বার পার্শ্ববর্তী একটি শহর। সেখানে যাওয়ার পর জানা যায় হিরাক্লিয়াস এক লক্ষ রোমান সৈন্য এবং এক লক্ষ আরব সৈন্যসহ মাআব নামক স্থানে অবস্থান করছে। মাআবও সিরিয়াতে বালক্বার পার্শ্ববর্তী একটি শহর। মুসলমানরা মা'আন-এ দু'দিন অবস্থান করে এবং পরস্পর পরামর্শ করে বলে, মহানবী (সা.)-এর কাউকে প্রেরণ করে শত্রুর সংখ্যাধিক্যের বিষয়টি জানানো উচিত। শত্রু সংখ্যা অনেক বেশি, তাই হয় তিনি (সা.) আমাদের সাহায্য করবেন অথবা অন্য কোন নির্দেশ দিবেন। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) মুসলমানদের উজ্জীবিত করেন। অতএব তারা সংখ্যায় তিন হাজার হওয়া সত্ত্বেও এগিয়ে যায় এবং বালক্বার নিকটবর্তী **মুশারেফ** নামক এক জনবসতির নিকট পৌঁছে রোমান সৈন্যদের মুখোমুখি হন। **মুশারেফ** (নামে) সিরিয়ায় বেশ কয়েকটি জনবসতি ছিল, যার একটি হল **হওরান** শহরের কাছে, একটি দামেস্কের কাছে

আর একটি বালক্বার কাছে। এরপর মুসলমানরা সেখান থেকে মূতার দিকে সরে যায়। **{উসদুল গাবাহ্ ফী মা'রিফাতিস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৭, আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৮ সালে প্রকাশিত}, (তফসীরে সগীর, পৃঃ ৩৯০ সূরা মরীয়ম এর ৭২ নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যা), (উসদুল গাবাহ্ (অনুবাদ), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৭, লাহোরের উর্দূ বাজারস্থ আল্ মীযান থেকে মুদ্রিত), (মু'জিমুল বুলদান, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৯, ৩৭, ১৫৩-১৫৪),**

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত যায়েদ (রা.), হযরত জা'ফর (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)'র শহীদ হওয়ার সংবাদ মহানবী (সা.) লোকজনকে শোনান। তাঁর (সা.) নিকট কোন সংবাদ আসার পূর্বেই তিনি (সা.) (একথা) জানিয়ে দেন। তিনি (সা.) বলেন, যায়েদ পতাকা হাতে তুলে নেন এবং তিনি শহীদ হন, এরপর জা'ফর (রা.) (পতাকা) নেন এবং তিনিও শহীদ হন অতঃপর আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) (পতাকা) নেন এবং তিনিও শহীদ হন। তখন মহানবী (সা.)-এর চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। তিনি (সা.) বলেন, এরপর আল্লাহ্‌র তরবারিগুলোর মধ্য থেকে একটি তরবারি সেই পতাকা (নিজ হাতে) তুলে নেন আর অবশেষে তার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা বিজয় দান করেন। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব গযওয়াতুম মওতা মিন আরযেশ্ শাম, হাদীস নংঃ ৪২৬২)**

মহানবী (সা.)-এর নিকট হযরত যায়েদ বিন হারেসাহ্ (রা.), হযরত জা'ফর (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)'র শাহাদতের সংবাদ পৌঁছলে তিনি (সা.) তাদের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য দণ্ডায়মান হন এবং হযরত যায়েদ (রা.)'র উল্লেখের মাধ্যমে বক্তব্য আরম্ভ করেন। তিনি (সা.) বলেন, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِزَيْدٍ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِزَيْدٍ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِجَعْفَرٍ وَلِعَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ رَوَاحَةَ অর্থাৎ হে আল্লাহ্! যায়েদকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ্! যায়েদকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ্! যায়েদকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ্! জা'ফর ও আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহাকে ক্ষমা কর। **{আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪, যায়েদ আল্ হিব্বু বিন হারেসাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত যায়েদ বিন হারেসাহ্ (রা.), হযরত জা'ফর (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) শহীদ হওয়ার পর মহানবী (সা.) মসজিদে বসে পড়েন। মহনবী (সা.)-এর চেহারায় তখন দুঃখ ও শোকের ছাপ প্রকাশ পাচ্ছিল। **(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল্ জানায়েয, বাব আল জুলুসু ইন্দাল মুসিবাতে, হাদীস নংঃ ৩১২২)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মূ'তার যুদ্ধের উল্লেখ পূর্বক বলেছেন। ইতোপূর্বে হযরত যায়েদ (রা.)'র স্মৃতিচারণের সময়ও প্রাসঙ্গিকভাবে এর উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু তবুও আমি কিয়দাংশ পুনরায় উপস্থাপন করছি। তিনি (রা.) লিখেন,

"সেই যায়েদ (রা.)-কেই মহানবী (সা.) এ (যুদ্ধের) সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন কিন্তু একই সাথে তিনি (সা.) এ নির্দেশও দেন, এখন আমি যায়েদকে সেনাপতি মনোনীত করছি, যায়েদ যদি যুদ্ধে শহীদ হন তাহলে তার স্থলে জা'ফর (রা.) সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিবেন আর যদি তিনিও মারা যায় তাহলে আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) নেতৃত্ব দিবেন। আর যদি তিনিও মারা যান তাহলে মুসলমানরা যার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করবে তিনিই সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিবেন। তিনি (সা.) যখন এই নির্দেশ দিচ্ছিলেন তখন এক ইহুদীও তাঁর (সা.) কাছেই বসা ছিল। সে বলে, আমি আপনাকে নবী হিসেবে মানি না কিন্তু আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন তাহলে এদের তিন জনের কেউই জীবিত ফিরে আসবে না, কেননা নবীর মুখ নিঃসৃত কথা অবশ্যই পূর্ণ হয়। সেই ইহুদী হযরত যায়েদ (রা.)'র কাছে গিয়ে বলে, তোমাদের রসূল যদি সত্য হন তাহলে তুমি জীবিত ফিরে আসবে না। উত্তরে

হযরত যায়েদ (রা.) বলেন, আমি জীবিত ফিরে আসবো কি আসবো না সেটি আল্লাহ্ তা'লা-ই ভালো জানেন কিন্তু আমাদের রসূল (সা.) অবশ্যই সত্য।" অর্থাৎ, না মানা সত্ত্বেও সেই ইহুদীর এ কথায় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর (সা.) কথা পূর্ণ হবেই। কিন্তু তারপরও যারা মানবে না তারা হঠকারিতা প্রদর্শন করে। তিনি (রা.) লিখেন, "আল্লাহ্ তা'লার প্রজ্ঞা অনুযায়ী এই ঘটনা হুবহু সেভাবেই ঘটে। প্রথমে হযরত যায়েদ (রা.) শহীদ হন। এরপর হযরত জা'ফর (রা.) সেনাবাহিনীর নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন এবং তিনিও শহীদ হন। তারপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) সেনাবাহিনীর নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনিও শহীদ হন। অতঃপর মুসলমান সৈন্যদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিলে কতেক মুসলমানের অনুরোধে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) ইসলামের পতাকা নিজের হাতে তুলে নেন আর আল্লাহ্ তা'লা তার মাধ্যমে মুসলমানদের বিজয় প্রদান করেন এবং তিনি খায়বার থেকে সৈন্যদের (নিরাপদে বাড়ি) ফিরিয়ে আনেন।" **(ফারিযায়ে তবলীগ আওর আহমদী খওয়াতীন, আনওয়ারুল উলূম, অষ্টাদশ খণ্ড, পৃঃ ৪০৫-৪০৬)**

আমি এখন যে ঘটনাটি বর্ণনা করতে যাচ্ছি তা পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু এতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)'র আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা এবং মহানবী (সা.) ও ইসলামের প্রতি অগাধ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিধায় এখানে তা বর্ণনা করা আবশ্যক।

হযরত উরওয়াহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত উসামাহ্ বিন যায়েদ (রা.) তাকে বলেছেন, মহানবী (সা.) একটি গাধার পিঠে আরোহণ করেন, যার ওপর গদি বিছানো ছিল এবং এর পেছনে 'ফাদাক' অঞ্চলের চাদর ছিল। তিনি (সা.) উসামাহ্ (রা.)-কে নিজের পিছনে বসিয়েছিলেন। তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) শুশ্রূষার জন্য বনু হারেস বিন খাযরাজ গোত্রে যান। এটি বদরের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। মহানবী (সা.) একটি বৈঠকের পাশ অতিক্রম করেন যেখানে মুসলমান, মুশরিক ও ইহুদীরা একত্রে বসা ছিল। তাদের মাঝে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-ও ছিল এবং সেই বৈঠকে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)ও ছিলেন। বৈঠকে উপবিষ্ট লোকদের ওপর যখন গাধার (চলার ফলে) ধুলা উড়ে গিয়ে পড়ে, তখন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই তার চাদর দিয়ে নিজের নাক ঢেকে নেয় এবং বলে, আমাদের ওপর ধুলা উড়িও না। মহানবী (সা.) তাদেরকে **'আসসালামু আলাইকুম'** বলেন এবং থেমে নিজ বাহন থেকে নেমে আসেন আর তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আহ্বান করেন ও কুরআন পড়ে শোনান। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বলে, ওহে! এটি ভালো কথা নয়। তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমাদের সভায় (এসব বলে) আমাদেরকে জ্বালাতন করো না; নিজের ডেরায় ফিরে যাও এবং যে তোমার কাছে আসে, তাকে এগুলো শোনাও। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) তৎক্ষণাৎ নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি আমাদের সভায় আসবেন; আমরা এটি পছন্দ করি। তিনি তখন একটুও ভয় করেন নি এবং কারো কোন তোয়াক্কাও করেন নি। এরপর এ নিয়ে সেখানে বাদানুবাদও হয়েছে। যাহোক, তার বিশেষ একটি ভূমিকা ছিল। **{সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্ সীরাত, বাব ফি দোয়াইন্ নবী (সা.) ইলাল্লাহ্ ... হাদীস নং: ১৭৯৮}**

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন, যাদের মাঝে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)ও ছিলেন। দিনটি ছিল শুক্রবার। অভিযানে অংশগ্রহণকারী বাকি সাহাবীরা যাত্রা করেছিলেন; কিন্তু আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) ভাবেন, আমি কিছুটা অপেক্ষা করে মহানবী (সা.)-এর সাথে জুমুআর

নামায পড়ে তারপর তাদের সাথে গিয়ে যোগ দিব। অতঃপর তিনি যখন মহানবী (সা.)-এর সাথে নামায পড়ছিলেন, তখন তিনি (সা.) তাকে দেখে জিজ্ঞেস করেন, কিসে তোমাকে তোমার সাথিদের সাথে রওয়ানা হতে বাধা দিয়েছে? তিনি (রা.) নিবেদন করেন, আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, আপনার সাথে জুমু'আর নামায পড়বো; এরপর তাদের সাথে গিয়ে যোগ দিব। মহানবী (সা.) বলেন, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবও যদি তুমি খরচ কর তবুও যারা অভিযানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে তুমি তাদের সমান অনুগ্রহ লাভ করতে পারবে না। **(সুনান আত্ তিরমিযী, আবওয়াবুল জুমুআ, বাব মা জাআ ফিস্ সাফরে ইয়াওমিল জুমুআহ্, হাদীস নং: ৫২৭)**

একথা বলার কারণ হল, এই মুহূর্তে আমি যে সৈন্যদল পাঠিয়েছি তা জুমু'আর নামাযের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। পথিমধ্যেও তোমরা নামায পড়তে পারতে।

হযরত আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেন, একদা আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে রমযান মাসে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বের হই। এত প্রচণ্ড গরম ছিল যে, আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই রোদ থেকে নিজের মাথা বাঁচানোর জন্য তা হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছিল অথচ মহানবী (সা.) ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) ব্যতীত আর কেউই আমাদের মধ্যে রোযাদার ছিলেন না। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুস্ সিয়াম, বাব আত্তাখীরু ফিস্ সওমে ওয়াল ফিতরে ফিস্ সফরে, হাদীস নং: ১১২২)**

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, "মদীনায় অবস্থানের পর সর্বপ্রথম কাজ ছিল 'মসজিদে নববী (সা.)' নির্মাণ করা। যে জায়গায় তাঁর (সা.) উটনী এসে বসেছিল তা মদীনার দু'জন মুসলমান বালক সাহ্ল ও সোহায়েল এর মালিকানাধীন ছিল। তারা হযরত আসাদ বিন যুরারাহ্ (রা.)'র তত্ত্বাবধানে বসবাস করত। এটি একটি পতিত জমি ছিল, যার এক অংশের কোন কোন স্থানে খেজুরের গাছ ছিল এবং অপর অংশে কিছু ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি ছিল। মহানবী (সা.) এটিকে মসজিদ ও নিজের বাড়িঘর নির্মাণের জন্য পছন্দ করেন এবং দশ দিনার অর্থাৎ প্রায় নব্বই রুপী দিয়ে এই জমি ক্রয় করা হয়। এরপর জায়গাটিকে সমতল করে ও গাছপালা কেটে 'মসজিদে নববী'-র নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়। মহানবী (সা.) স্বয়ং দোয়া করে (এর) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আর যেমনটি 'মসজিদে কুবা'-র ক্ষেত্রে হয়েছিল, সাহাবীগণ রাজমিস্ত্রী ও শ্রমিকের কাজ করেন, যাতে কখনো কখনো মহানবী (সা.) স্বয়ং অংশগ্রহণ করতেন। ইট বহনের সময় কখনো কখনো সাহাবীরা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) আনসারীর এই পঙ্‌ক্তি পাঠ করতেন:

هٰذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْبَرَ
هٰذَا اَبَرُّ رَبَّنَا وَاَطْهَرَ

অর্থাৎ এই বোঝা খায়বারের বাণিজ্য-সামগ্রীর বোঝা নয় যা পশুর পিঠে বোঝাই করে এসে থাকে। বরং হে আমাদের প্রভু! এই বোঝা তাকওয়া ও পবিত্রতার বোঝা, যা আমরা তোমার সন্তুষ্টির জন্য বহন করি। আবার কখনো কখনো কাজ করার সময় সাহাবীগণ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)'র এই পঙ্‌ক্তি পড়তেন:

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْاَجْرَ اَجْرُ الْاٰخِرَهْ
فَارْحَمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আসল প্রতিদান তো কেবল পারলৌকিক প্রতিদান; অতএব তুমি নিজ কৃপায় আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ বর্ষণ কর।

সাহাবীগণ এই পঙ্‌ক্তি পাঠ করার সময় মহানবী (সা.)ও কখনো কখনো তাদের সুরে সুর মেলাতেন। আর এভাবে এক দীর্ঘ সময়ের পরিশ্রমের পর এই মসজিদ (নির্মাণ) সম্পন্ন হয়।" {সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.), পৃ: ২৬৯-২৭০)

এই ছিল হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) সম্পর্কে স্মৃতিচারণ। আমি যেহেতু একটি জানাযাও পড়াব এবং প্রয়াতের স্মৃতিচারণও করতে হবে তাই আমি আজ একজন সাহাবীর-ই স্মৃতিচারণ করছি।

যেমনটি আমি বলেছি, একজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করব, তিনি হলেন মোহতরম ডাক্তার লতিফ আহমদ কুরাইশী সাহেব, যিনি মঞ্জুর আহমদ কুরাইশী সাহেবের পুত্র ছিলেন। ১৯ জানুয়ারি, ২০২০ সনে দুপুর প্রায় ১টায় নিজের বাসায় প্রায় ৮০ বছর বয়সে ঐশী নিয়তি অনুযায়ী তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। তিনি ভারতের আজমীর শরীফে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সালে তার পিতা মঞ্জুর কুরাইশী সাহেব হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। তার মাতা শ্রদ্ধেয়া মনসুরা বুশরা সাহেবা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মুনশী ফাইয়ায আলী কপুরথলী সাহেব (রা.)'র দৌহিত্রী এবং হযরত শেখ আব্দুর রশীদ মিরঠী সাহেব (রা)'র পৌত্রী; তিনি এখনো জীবিত আছেন। মোকাররম ডাক্তার কুরাইশী সাহেবের পিতামাতা দেশ বিভাগের সময় হিজরত করে লাহোরে চলে এসেছিলেন। এখানেই তিনি মাধ্যমিক পাশ করেন। এতে তিনি খুবই ভালো ফলাফল অর্থাৎ প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর কিং এডওয়ার্ড মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। আর সে যুগে তিনি সবচেয়ে কম বয়সী ছাত্র হিসেবে **এমবিবিএস** করেন। সেখানকার অধ্যক্ষ সাহেব বিশেষভাবে এর উল্লেখ করেন। এরপর ১৯৬১ সালে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড-এ আসেন। এখানে প্রথমে তিনি শিশুরোগের ওপর ডিপ্লোমা করেন, এরপর **এমআরসিপি** ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি সামারসেট-এর ইয়োভেল-এ কনসালটেন্ট হিসেবে চাকরি লাভ করেন। সেখানে তিনি বিশেষভাবে হৃদরোগ সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করেন। ১৯৬৮ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ডাক্তার সাহেবকে বলেন, আপনি আমাদের কাছে কখন আসছেন? তখন ডাক্তার সাহেব বলেন, যখন আপনি আদেশ করবেন। তখন তিনি (রাহে.) বলেন, আপনি চলে আসুন। অতএব তিনি ইংল্যান্ড ছেড়ে রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হন এবং রাবওয়ার ফযলে উমর হাসপাতালে ডাক্তার সাহেবের নিযুক্তি হয়। এরপর তিনি দীর্ঘদিন সেখানে কাজ করতে থাকেন। ১১ জুলাই, ১৯৮৩ সালে ফযলে উমর হাসপাতালের চীফ মেডিকেল অফিসার নিযুক্ত হন এবং ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্বে বহাল থাকেন। ষাট বছর বয়স পর্যন্ত ফযলে উমর হাসপাতালে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করতে থাকেন। ২০ আগস্ট, ১৯৯৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ সনে পুনরায় ফযলে উমর হাসপাতালে যোগদান করেন এবং ১০ সেপ্টেম্বর, ২০০০ সন পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ফযলে উমর হাসপাতালে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এভাবে ফযলে উমর হাসপাতালে তিনি প্রায় ত্রিশ বছর সেবা প্রদান করেন। ওয়াকফে যিন্দেগী ডাক্তারের দায়িত্ব ছাড়াও ডাক্তার লতীফ কুরাইশী সাহেব কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়া ও কেন্দ্রীয় আনসারুল্লাহ্‌রও বিভিন্ন পদে থেকে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। বর্তমানেও তিনি আনসারুল্লাহ্‌র বিশেষ সদস্য ছিলেন। এর মাঝে দু'বছর তিনি মজলিসে ইফতার সদস্যও ছিলেন। তিনি দু'টি পুস্তকও লিখেছেন 'স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম-নীতি' এবং 'Healthy living'– যা বিশেষভাবে পাকিস্তানের লোকদের জন্য

ছিল। তার স্ত্রীও কিছুদিন পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন আর আমি তারও স্মৃতিচারণ করেছিলাম। মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবের কন্যা ছিলেন তিনি। আমি গত জুমু'আয় তার জানাযাও পড়িয়েছিলাম আর এর দু'দিন পরেই অর্থাৎ তাঁর (স্ত্রীর) মৃত্যুর পনের দিন পর তিনিও মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারে, যেমনটি আমি তাঁর স্ত্রীর স্মৃতিচারণেও উল্লেখ করেছিলাম, তিন ছেলে ও দু'জন মেয়ে রয়েছেন। তাঁর ছেলে ডাক্তার আতাউল মালিক বলেন, আমি যখন থেকে বুঝতে শিখেছি– আমার পিতা কখনো তাহাজ্জুদ নামায ছাড়েন নি। অনুরূপভাবে আমাদের মা আমাদেরকে বলতেন, বিয়ের প্রথম দিন থেকেই তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। মোটকথা, প্রায় পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি প্রতিদিন বিনা ব্যতিক্রমে তাহাজ্জুদ নামায পড়েছেন। মায়ের অন্তিম অসুস্থতার সময়ও বাবা অনেক পরিশ্রম করে তাঁর স্বাস্থ্যের যত্ন নিতেন। ডায়ালাইসিস করানোর জন্য তাকে হাসপাতালেও নিতে হতো এবং সেখানে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো। (শারীরিক) ধকলও ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনো তাহাজ্জুদ নামায ছাড়েন নি। রোগীদের সাথে একান্ত সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করতেন। দরিদ্রদের প্রতি সহমর্মি ছিলেন। দূরদূরান্ত থেকে দরিদ্র রোগীরা তাঁর কাছে আসত, ঔষধ-পত্র নিত এবং আরোগ্য লাভ করত। অনেক রোগীর কাছ থেকে তিনি ফীস-ও নিতেন না। কখনো কখনো নিজের পক্ষ থেকে (তাদেরকে) সাহায্য করতেন। সবসময় উপদেশ দিতেন, আরোগ্য আল্লাহ্ তা'লার হাতে এবং তার তিন সন্তানকেও, যারা প্রত্যেকে চিকিৎসক, বিশেষভাবে বারংবার এই বিষয়ে অনুপ্রাণিত করতেন, সবসময় নিজের রোগীদের জন্য দোয়াতে রত থাক। তার ছেলে বলেন, আমি কখনো কখনো আমার রোগীদের জন্য আমার পিতাকে দোয়ার অনুরোধ করলে পরের দিন তিনি ফোন করে জিজ্ঞেস করতেন, রোগীর অবস্থা কী? আমি তার জন্য দোয়া করেছি।

১৯৬৯ সালে যখন তিনি ইংল্যণ্ডে কনসালটেন্ট হিসেবে চাকরী করতেন তখন পার্থিব সকল স্বার্থ পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা করে রাবওয়া চলে আসেন। আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস ছিল যে, সমস্ত জাগতিক এবং ধর্মীয় কাজ তিনি স্বয়ং সমাধা করবেন আর সন্তানরাও উচ্চশিক্ষা অর্জন করবে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন আর কখনও আর্থিক সমস্যা দেখা দেয় নি আর সন্তানরাও উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছেন। তার তিন সন্তানই ডাক্তার আর বর্তমানে তাদের অধিকাংশই আমেরিকাতে রয়েছে। তিনি (অর্থাৎ মরহুম) তার পিতামাতার অনেক সেবা করতেন। শেষ সময় পর্যন্ত নিজের মা'কে নিজেই খাবার পরিবেশন করতেন আর তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি, তার মা এখনও জীবিত আছেন আর তার কাছেই থাকতেন। এরপর তার পুত্র বলেন, আমার আমেরিকায় যাওয়ার সময় পরীক্ষার প্রস্তুতি ইত্যাদিতে তিনি আমাকে অনেক সাহায্য করেন। আমাদের অনেক উৎসাহ দিতেন। লৌকিকতাকে খুবই অপছন্দ করতেন। সব সময় সাদামাটা জীবন যাপন করেছেন আর সকল ছোট ও বড় কাজের পূর্বে যুগ খলীফার সমীপে দোয়ার জন্য পত্র লিখতেন এবং পরামর্শ নিতেন।

তার দ্বিতীয় পুত্র ডাক্তার মুহাম্মদ আহমদ মাহমুদ সাহেব বলেন, খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তার সম্পর্কে বলেছিলেন, তিনি শুধু ডাক্তারই নন বরং তিনি দোয়াগো ডাক্তার। প্রত্যেক রোগীর জন্য দোয়া করেন। সকল ব্যবস্থাপত্রে ঔষধের নাম লেখার পূর্বে **'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'** লিখতেন এবং এর নীচে **'হুয়াশ শাফী'** লিখতেন। আর একইভাবে অন্যান্য ডাক্তারদেরও উপদেশ দিতেন, রোগীদের জন্য দোয়া কর, কেননা প্রকৃত

আরোগ্য আল্লাহ্ তা'লার হাতে। সবশেষে তিনি বলেন, আমার মায়ের মৃত্যুর পর শোরকোট থেকে একজন রোগী আসে। তখন তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন এবং গাড়িতে বসা ছিলেন। তিনি গাড়ি থেকে নেমে রোগীকে দেখেন এবং ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন। আর অধিকাংশ সময় দরিদ্র রোগীদেরকে নিজের পকেট থেকে ঔষধ কিনে দিতেন। তার মেয়ে বলেন, একজন মহিলা আমাকে বলেছেন, তার বাবার যখন হার্ট এ্যাটাক হয় তখন তিনি অর্থাৎ সেই মহিলার বাবা বাড়িতে একা ছিলেন। তিনি অর্থাৎ ডাক্তার সাহেব তার বাসায় গিয়ে তাকে দেখেন, তার সন্তানদেরকে ফোন করেন এবং তার সন্তানরা বাসায় না আসা পর্যন্ত তিনি তাকে একা ফেলে চলে যান নি, রোগীর পাশেই বসে ছিলেন। তিনি প্রতি বছর পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে যুক্তরাজ্য এবং কাদিয়ান জলসায় অংশগ্রহণ করতেন। তার পরিশ্রম করার অভ্যাস ছিল। সর্বদা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে কাজ করেছেন। তার মেয়ে বলেন, আমার মায়ের মৃত্যুর পর বাবা আমাকে বলেন, তোমার মায়ের সকল জিনিসপত্র গোছানোয় আমাকে সাহায্য কর। কাজ শেষ হলে তিনি এমনভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকেন যে, আমি নিজেই লজ্জা পাচ্ছিলাম। আর কাজ করার সময় একটি কথা তিনি আমাকে বার বার বলছিলেন, সব কাজ দ্রুত আজকের মধ্যেই শেষ করে নাও, কেননা আমার কাছে বেশি সময় নেই। তখন আমি তার কথায় বিশেষ মনোযোগ দেই নি আর বেশি কিছু জিজ্ঞেসও করি নি, কেননা তিনি তার স্বপ্ন ইত্যাদি আমাদেরকে খুব একটা বলতেন না। কিন্তু পরবর্তীতে আমার ভাই বলেছিল, তিনি নিজের ব্যাপারে কোন স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমার এখন সময় অল্প অবশিষ্ট আছে। মৃত্যুর এক ঘন্টা পূর্বেও সকাল নয়টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত নিজ বাসা সংলগ্ন ক্লিনিকে রোগী দেখছিলেন। একটার সময় বাড়ি আসেন, ওযু করে মসজিদে মুবারকে গিয়ে নামায পড়ার ইচ্ছা ছিল। বিছানায় বসে জুতা খুলতে খুলতেই হঠাৎ তার গুরুতর হার্ট এ্যাটাক হয় এবং তিনি তার নিজ প্রভুর সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে যান।

প্রতিবেশীদের সাথেও তার হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং প্রতিবেশীরাও তার অনেক খেয়াল রাখতেন। কবিতা এবং সাহিত্যের প্রতিও তার অনেক আগ্রহ ছিল। দুর্‌রে সমীন, কালামে মাহমুদ এবং দুর্‌রে আদ্‌ন-এর নযমগুলো অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে পাঠ করতেন। বহু ক্যাসেট তিনি রেকর্ড করিয়েছেন। উত্তম পঙ্‌ক্তিগুলোর ভূয়সী প্রশংসা করতেন। জ্ঞান পিপাসু ছিলেন। জামাতের মুরুব্বী তার ভায়রা-ভাই সৈয়দ হোসেইন আহমদ সাহেব বলেন, ডাক্তার সাহেব বলেছেন, জামা'তের হাসপাতালে সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে লণ্ডন থেকে পাকিস্তানে যাওয়ার পর লাহোর থেকে ট্রেনযোগে (রাবওয়ায়) নেমে সোজা প্রাইভেট সেক্রেটারীর দপ্তরে চলে যান। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) তাকে ভেতরে ডাকেন। হুযূর (রাহে.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, চলে এসেছেন? তিনি উত্তর দেন, জ্বি, হুযুর! আমি উপস্থিত। তখন হুযূর (রাহে.) বলেন, আপনার ঘর আমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়ে বন্ধ করে রেখেছি, আপনি গিয়ে নাযেরে আলা সাহেবের কাছ থেকে চাবি নিয়ে সেখানে থাকুন। তিনি বলেন, আমি গিয়ে ঘর খুলে দেখতে পাই সেখানে কেবল দু'টি চৌকি আছে। তারপর তিনি গিয়ে আরো চৌকি এবং ঘরের জিনিসপত্র কিনে এনে সেখানে বসবাস আরম্ভ করেন। কোন প্রকার আদিখ্যেতা বা অন্য কিছু ছিল না যে, আমি বিলেত থেকে এসেছি। প্রথম বছরই জলসায় তার অতিথি চলে আসে। জলসার দিনগুলোতে তিনি নিজে খড়ের ওপর ঘুমাতের আর নিজের ঘর অতিথিদের দিয়ে দেন। তিনি তার শ্বশুর মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবের অনেক সেবা করেছেন, নিজের শাশুড়িরও অনেক সেবা করেছেন। হোসেইন সাহেব বলেন, ডাক্তার

সাহেব বলতেন, আমার সাথের ডাক্তাররা, যারা বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তারা আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, তুমি রাবওয়ার মতো ছোট একটি গ্রামে যে কাজ কর এর বিনিময়ে তুমি কী পাও? তিনি বলেন, আমি উত্তরে বলতাম, মানুষ এটি ধারণাও করতে পারবে না আর না আপনারা এটি বুঝতে পারবেন যে, আমি রাবওয়াতে বসে যে কাজ করছি এর প্রতিদান কী! যে দোয়া পাচ্ছি সেটির কোন বিনিময় বা মূল্য হয় না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীগণ (রা.), হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা (রা.), হযরত সৈয়্যদা আমাতুল হাফিয বেগম সাহেবা (রা.)'র সেবা করার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)'র ইন্তেকালের সময় তিনি ইসলামাবাদে হুযূরের কাছে ছিলেন। অনুরূপভাবে আরো অনেক বুযূর্গের সেবা করার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছেন। ডাক্তার আব্দুল খালেক সাহেব বলেন, আমি যদি এটি লিখি যে, দরিদ্রদের ডাক্তার এই শহর ছেড়ে চলে গেছেন তবে অতিরঞ্জন হবে না। তিনি অর্ধ-শতাব্দীরও অধিক কাল যাবৎ অত্রাঞ্চলের নিঃস্ব ও দরিদ্র রোগীদের ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সেবা করেছেন। তিনি যখন হাসপাতালের চীফ মেডিকেল অফিসার ছিলেন তখন হাসপাতালের বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য স্বয়ং লাহোরে যেতেন। বাজারের দরদাম যাচাই করে উন্নত ও ভালো মানের সামগ্রী ক্রয় করে আনতেন। আর অধিকাংশ সময় এ কাজে পুরো দিন লেগে যেত। কিন্তু তবুও জামা'তের সম্পদ ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার সাথে খরচ করা ছিল তার (অনন্য) বৈশিষ্ট্য। হাসপাতালে আল্ট্রাসাউন্ড এবং এন্ডোসকপি বিভাগের সংযোজনও তিনি করেন। শুরুতে তিনি পায়ে হেঁটে এবং সাইকেলে চড়ে অনেক বুযূর্গ ব্যক্তিত্ব এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের দেখে আসতেন এবং ব্যবস্থাপত্র দিতেন। ফযলে উমর হাসপাতাল সম্পর্কে তিনি বলতেন, খলীফাদের দোয়া এই হাসপতালের সাথে রয়েছে, আর আমি চিকিৎসার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে এখানে অনেক মো'জেযা প্রত্যক্ষ করেছি।

ডাক্তার সুলতান মুবাশ্বের সাহেব লিখেন, ফযলে উমর হাসপাতালে প্রায় ত্রিশ বছরব্যাপী সেবাকালে তাঁর ওপর কোন কোন পরীক্ষাও আসে। কিন্তু খোদা তা'লার বিনয়ী এবং দরবেশ এই বান্দা মাথা নত করে তা সহ্য করতেন এবং পাহাড়ের মতো অটল থেকে খোদা তা'লার দরবারে দোয়া করতেন। (হুযূল বলেন,) সুলতান মুবাশ্বের সাহেব এটি যথার্থই লিখেছেন। কিছু কথা আমিও জানি। আমার জানা আছে, খুবই গাম্ভীর্যের সাথে কোন অভিযোগ অনুযোগ না করে যেসব বিপদ এসেছে বা যেসব পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন তা সহ্য করেছেন। আর এরপর আল্লাহ্ তা'লাও তাকে অনেক পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। আর কখনো কোন কর্মকর্তা বা সহকর্মিদের ব্যাপারে কোন অভিযোগ বা কষ্টের কথা তিনি কারো কাছে প্রকাশ করেন নি। ডাক্তার সুলতান মুবাশ্বের সাহেব আরো লিখেন, আমার স্মরণ আছে– তিনি শুধু ধনী এবং সম্ভ্রান্তদেরই চিকিৎসা করতেন– এমন নয়, বরং যেমনটি বলা হয়েছে তিনি সবার চিকিৎসা করতেন। ডাক্তার সুলতান মুবাশ্বের সাহেব এরপর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, একবার দুপুর বেলা ড্রাইভার রহমত আলী সাহেবের স্ত্রী জরুরি বিভাগে ভর্তি হন। আমি তাকে (অর্থাৎ মরহুম ডাক্তার সাহেবকে) হাসপাতালে আসতে অনুরোধ করলে তিনি পূর্ব দ্বারুল উলুমস্থ তার বাড়ি থেকে কয়েক মিনিটের মধ্যে হাসপাতালে এসে উপস্থিত হন। তার বাড়ি হাসপাতাল সংলগ্ন ছিল না, বরং তার বাসা ছিল রাবওয়ার একেবারে অপর প্রান্তে। সেখান থেকেই তিনি তৎক্ষণাৎ চলে আসেন। তিনি জামা'তের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। বহুবার এমন হয়েছে যে, আমরা তরুণ ডাক্তাররা আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়মনীতির

সীমাতিরিক্ত কঠোরতার কারণে হতাশ হলে তিনি আমাদেরকে অত্যন্ত স্নেহের সাথে বসিয়ে বুঝাতেন, আমাদের সর্বাবস্থায় নিযাম (অর্থাৎ ব্যপস্থাপনার) আনুগত্য করতে হবে আর ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে।

তার স্ত্রী শওকত সাহেবা যখন ইন্তেকাল করেন, এর পরের দিন তার দুই ভাগ্নের বউ-ভাতের দাওয়াত ছিল। সেদিনই তিনি বরের বাড়িতে গিয়ে জানান, আমার স্ত্রী মৃত্যু বরণ করেছেন, কিন্তু আপনারা অনুষ্ঠান অবশ্যই করুন, আপনাদের অনুষ্ঠান বন্ধ করবেন না, কেননা তার স্ত্রী, যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, বরের খালা ছিলেন। হোসেইন সাহেবের দু'ছেলেই বর ছিল আর তাদের ওলীমার দাওয়াত ছিল। কিন্তু তিনি বলেন, আপনারা অবশ্যই অনুষ্ঠান করুন, অনুষ্ঠান বন্ধ করবেন না। তার ছেলে ডাক্তার মাহমুদ বলেন, আমি তাহলে দাওয়াতে না গিয়ে বাড়িতেই থাকবো। তিনি বলেন, না, খোদা তা'লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তিনি এর জন্য নসীহত করেন এবং বলেন, এমন পরিস্থিতিতেই মানুষের পরীক্ষা হয়ে থাকে এবং ধৈর্য ও আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকার পরিচয় পাওয়া যায়। এরপর ছেলেকেও সাথে নিয়ে রীতিমতো দাওয়াতে অংশগ্রহণ করেন এবং পাড়ায় এই বিষয়টি নিশ্চিত করেন যে, ওলীমার দাওয়াতের সময় পর্যন্ত মৃত্যুর সংবাদ যেন কারো কাছে না পৌঁছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি অনুগ্রহ ও ক্ষমাসূলভ আচরণ করুন। তাঁর সন্তানদেরও ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন, একাধারে এই ছেলে-মেয়েদের মা ও বাবা মৃত্যু বরণ করেছেন। আল্লাহ তা'লা তাদের স্বামী-স্ত্রী উভয়ের যেসব পুণ্য ও নেকী রয়েছে তা তাদের সন্তানদের মাঝে প্রবহমান রাখুন। যেমনটি আমি বলেছি, তার মা এখনও জীবিত আছেন এবং খুবই অসুস্থাবস্থায় রয়েছেন, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতিও কৃপা ও অনুগ্রহ করুন।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০, পৃঃ ৫-৯)
(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)